ই-জার্নাল গবেষণাধর্মী জার্নাল
সাহিত্যসেনা
August : 2026 Sahityasena Journal Volume 01, Issue :11

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের পেশা ও ভাষা : একটি সমীক্ষা

ড. হজরত উমার ফারুক

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আবহমান কাল ধরেই চলছে মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম। একদা ভারতবর্ষে জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা ছিল সমাজ ব্যবস্থার মূল কাঠামো স্বরূপ। উচ্চবর্ণের মানুষ ছিলো রাষ্ট্র পরিচালনা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মূল নিয়ন্ত্রক। নিম্নবর্গের মানুষের কাজ উচ্চবর্ণের মানুষের আজ্ঞাবহ হয়ে সেবা করা। জাতির সঙ্গে পেশার এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যদিও উত্তর আধুনিককালে জাতিগত পেশায় বৈচিত্র দেখা গেছে। মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির অবস্থান বর্তমান সমাজব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। সাম্যবাদের ভাবনায় যা শাসক ও শোষিত শ্রেণি। আপন অধিকার থেকে বঞ্চিত শ্রেণিকে আমরা নিম্নবর্গ বলতে পারি। নিম্নবর্গের অবস্থান বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে ডোম,শবর, চণ্ডাল সহ অন্যান্য নিম্নবর্গ বা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন চিত্র বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত হয়েছে। পরবর্তীতে মঙ্গলকাব্য,জীবনী সাহিত্য, নাথ সাহিত্য সহ মধ্যযুগের কাব্যধারা বেয়ে আধুনিক কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন ও চালচিত্র বর্ণিত। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে নিম্নবর্গের জীবনকথা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্র সমসাময়িক কালে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছোটগল্প রচনায় আপন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ছোটগল্পের ভাঙ্গা গড়ার কালে তিনি ছোটগল্প রচনা করে বাংলা ছোটগল্পকে একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। বিষয় নির্বাচন, চরিত্র চিত্রণ ও আঙ্গিক গঠনে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণি,বর্ণ ও পেশার মানুষ তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। "প্রভাতকুমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লেখক ।" ১

তিনি তাঁর ছোটগল্পে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। সমাজের উচ্চবর্ণের পাশাপাশি নিম্নবর্গের জীবনালেখ্য রচনায় তিনি মুন্সীআনার পরিচয় দিয়েছেন। বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে তাঁর গল্পে। নিম্নবর্গের মানুষের পেশা ও ভাষা তিনি বাস্তবসম্মতভাবে ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'হীরালাল', 'প্রেম ও প্রহার' ,'দুধ মা', 'বন্য শিশু' গল্পে নিম্নবর্গের জীবন কথা চিত্রিত। এছাড়াও 'বিষবৃক্ষের ফল', 'পত্নীহারা', 'কুড়ানো মেয়ে', 'হতাশ প্রেমিক', ' বলবান জমাতা', ' হারাধন' সহ অন্যান্য ছোটগল্পে নিম্নবর্গের পেশা ও ভাষার বাস্তবসম্মত প্রয়োগ লক্ষণীয়। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে তাঁর নির্বাচিত কিছু ছোটগল্প আলোচনা করা হলো।

হীরালাল:

প্রভাতকুমারের 'হীরালাল' গল্পটি তাঁর 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে সংকলিত হয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। গল্পটি 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই ছোটগল্পের প্রধান চরিত্র হীরালাল। সে নিম্নবর্গের ডোম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তার পরিচয় দিয়েই গল্পের সূচনা হয়েছে ।

"হীরালাল জাতিতে ডোম। বৃদ্ধ হইয়াছে, বয়স ৬০ বৎসরের কম হইবে না, আকার খর্ব, দেহখানি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অধিক স্থূলও নহে। কিন্তু এত বয়স হইলেও তাহার দেহে এখনও বল আছে।...

গ্রামখানির নাম মাণিকপুর। গ্রামের যেটা ডোমপাড়া, যেখানে অন্যান্য ডোমদের বাস, সেখানে হীরু থাকে না। গ্রামের অপর প্রান্তে, শ্মশান হইতে অল্প দূরে একখানি মাটির ঘরে সে একাকি বাস করে।" ২

হীরুর স্ত্রী, সন্তান কেউ নেই। সকলেই গত হয়েছে। কথিত আছে ভূতের সঙ্গে তার বিশেষ ভাব রয়েছে। গভীর রাতে তার সঙ্গে ভূতের কথোপকথন হয় তাই সে ডোমপাড়ায় না থেকে লোকালয় থেকে দূরে শ্মশানের কাছে বসবাস করে। সে ওষুধপত্র, তন্ত্র মন্ত্রও জানে। আশেপাশের গ্রামের লোকজন বিভিন্ন রোগের জন্য তার কাছে ওষুধ নিতে ও ঝাড়ফুঁক করতে আসে। একদিন রাত ১১ টা নাগাদ এক স্ত্রীলোক হীরুর বাড়িতে ওষুধ নেওয়ার জন্য আসে। সেই স্ত্রীলোক বললো-

" শেয়ালের বড় উপদ্রব হয়েছে,বুঝেছ! রান্নাঘরের বেড়া ফাঁক করে, রোজ রাত্রে শেয়াল ঢুকে, আমার হাঁড়ি খেয়ে যায়। দুটো শেয়াল মরে, এই রকম খানিকটা বিষ তুমি আমায় দিতে পারো?"৩

এই স্ত্রীলোকের কথাবার্তা ও আচার-আচরণে হীরুর মনে সন্দেহ হয়। সে চড়া দামে তাকে বিষ দেয়। বিষ নিয়ে স্ত্রীলোক চলে গেলে হীরু তার অনুসরণ করে। স্ত্রীলোক এক ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রামে এক বাড়িতে প্রবেশ করে। এই মহিলা বিনোদলালের স্ত্রী নীরদা। তার স্বামী দুইবছর ধরে বিদেশে কর্মরত। সে তার চার বছরের একটি পুত্র সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে থাকে। এক মাসের ছুটি নিয়ে বিনোদ বাড়ি ফিরছে । এরপর গল্প নতুন মোড় নিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়েছে। হীরু রাতে প্রাচীর টপকে বিনোদের ঘরে প্রবেশ করে। এত রাতে তাকে দেখে নীরদা অবাক হয়ে বললো-

" হীরু তুই চোরের মত এখানে কি করছিস? বাড়ি ঢুকলি কি করে?

হীরু বলিল, পাঁচিল টপকে এসেছি। কাল অষুধ নিয়ে এলে ওষুধের ফলটা কিরকম হলো তাই দেখতে এসেছি।" ৪

এই কথা শুনে নীরদা বিস্মিত হয়ে বলে, ওষুধ কোন কাজ করছে না। ওষুধ কাজ না করার কারণ হীরু বিষের গুঁড়ো না দিয়ে রাতের বেলা ভুল করে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল। তাই বিনোদ নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। নীরদা, হীরুকে বলে সে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। হীরু যে জবাব দেয় তাতে নিম্নবর্গের ভাষার বাস্তব নিদর্শন মেলে। সে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল-

" হ্যাঁ-লো হারামজাদি শয়তানী নচ্ছারনী! হ্যাঁ! তোকে ফাঁকি দিয়েই তো টাকা নিয়েছি। এখন আমি যে জন্য এসেছি তা বলি শোন। নে, তোর গয়না কাপড় বাক্স থেকে বের করে, পুঁটুলি বেঁধে নে। তোকে, আজ রাত্রেই কলকাতায় যেতে হবে।" ৫

হীরুর প্রস্তাবে রাজি না হলে সে বিনোদকে সব বলে শোরগোল শুরু করে দেবে। একপ্রকার বাধ্য হয়েই নীরদা হীরুর সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্টেশনের দিকে রওয়ানা দিল। পরদিন বিনোদ তার স্ত্রীর পদস্খলনের বিষয় জানতে পেরে জমিজামা বিক্রি করে ছেলেকে নিয়ে অমৃতসরে চলে গেল। এভাবে গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

আলোচ্য গল্পে গল্পকার প্রভাতকুমার নিম্নবর্গের হীরালালকে প্রধান চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন। নীরদাকে একজন খল চরিত্র হিসেবেই পাঠক গল্পে পেয়েছে। সে উচ্চবর্ণের গৃহবধূ হলেও তার স্বভাব চরিত্রে নিম্নরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রেম ও প্রহার :

প্রভাতকুমারের 'প্রেম ও প্রহার' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়। পরবর্তীতে গল্পটি তাঁর 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে সংকলিত হয়। আলোচ্য গল্পটি নিম্নবর্গের এক দম্পতির কলহ বিবাদ, বিচ্ছেদ ও মিলনের ঘটনা নিয়ে রচিত। গল্পের প্রধান চরিত্র পেশায় গোয়ালা ভজহরি গোপ ও তার স্ত্রী মোক্ষদা সুন্দরী । তাদের দাম্পত্য কলহ দিয়ে গল্পের সূচনা হয়েছে। গল্পকার প্রভাতকুমার নিম্নবর্গের এক দম্পতির সংসারের নিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন-

"প্রভাতকুমার বাঙালি সংসারের নিপুণ কলাবিদ। তাঁর স্নিগ্ধ মমত্বের স্পর্শে আমাদের পরিচিত পারিবারিক জীবনের হাসি কান্না গুলি মনোরম হয়ে দেখা দিয়েছে।"৬

'প্রেম ও প্রহার' গল্পের নামকরণের মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের কলহ ও মিলনের ইঙ্গিত রয়েছে। পদ্মা তীরবর্তী রায়গঞ্জনামা গ্রামে বসবাস করে গোয়ালা সম্প্রদায়ের ভজহরি গোপ ও তার স্ত্রী মোক্ষদা সুন্দরী।গল্পের সূচনা স্বামী স্ত্রীর উত্তপ্ত বাক্যালাপের মাধ্যমে। উভয়ের কথোপকথনে নিম্নবর্গের ভাষার সার্থক প্রয়োগ করেছেন গল্পকার। ভজহরি উচ্চস্বরে বলে-

" খপর্দার মাগী মুখ সামলে কথা কোস নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।"৭

ভজহরি স্ত্রীকে জুতা-পেটা করার কথা বললে পাল্টা জবাব দিয়েছে মোক্ষদা। সে বলল-

" ইস! রাগ দেখ পুরুষের! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবেন। জুতো পাবি কোথা তাই শুনি? বাপের জন্মে জুতো কখনও পায়ে দিয়েছিস রে মিনসে।"৮

স্বামী স্ত্রীর বাকবিতণ্ডায় গল্পে ইতর শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মোক্ষদা স্বামীকে সম্বোধন করেছে 'মিনসে' বলে। স্বামী পয়সা রোজগার করতে পারে না বলে সে খোটা দিয়েছে। তার পাল্টা জবাব দিয়েছে ভজহরি। সে স্ত্রীকে 'শুয়োরকে বাচ্ছি', 'মাগী', 'শালী হারামজাদি' বলে সম্বোধন করেছে। তাদের উভয়ের মুখে বহু কথ্য শব্দের ব্যবহার দেখা গেছে। 'ন্যাকা', 'গেরাস', 'শরীলটে', 'গায়ে গতরের', 'নোকের' শব্দ প্রয়োগ রয়েছে। ভজহরি ও মোক্ষদার কলহ বাকযুদ্ধে সীমাবদ্ধ থাকে না, কখনো তা হাতাহাতি পর্যায়ে পৌঁছয়। একদিন মোক্ষদার সঞ্চিত অর্থ গোপনে ভজহরি নিয়ে ছিপ লাগানোর জন্য পিতলের হুইল কিনে আনে। এই নিয়ে সংসারে কুরুক্ষেত্র বাঁধে। ভজহরি স্ত্রীর মুখ লক্ষ্য করে জ্বলন্ত কলিকা ছুঁড়ে মারে। মোক্ষদাও পাল্টা আক্রমণ করে। সে ভজহরির মাথায় সজোরে হুঁকো ছুঁড়ে মারে, পিঠে কয়েক ঘা বসিয়ে দেয়। মাথায় আঘাত পেয়ে মেজাজ বিগড়ে ভজহরি হুমকির সুরে বলল-

" দাঁড়া শালী হারামজাদি; তুই আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিস, যাচ্ছি পুলিশে নালিশ করতে। তিনটি বচ্ছর তোকে যদি আমি জেল না খাটাই তাহলে মিনসের ছেলেই নই।"৯

এই হুমকি দিয়ে ভজহরি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মোক্ষদা ভাবে সত্যিই কি তার স্বামী তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে গেছে। রাতে সে স্বামীর জন্য খাবার ঢেকে রেখে নিজে খেয়ে শুয়ে পড়ল। পরদিন বেলা

বাড়লেও স্বামী বাড়ি না ফেরায় সে থানায় খোঁজ নিতে যায়। দারোগবাবু জানান যে, রায়গঞ্জ ঘাটে এক ব্যক্তির ধুতি গামছা পাওয়া গেছে। দারোগা মৃত ব্যক্তির নামধাম ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করল। পরবর্তীতে মোক্ষদা গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় শ্যামবাজারে রামদয়াল মিত্রের বাড়িতে ঝি হিসেবে কাজ শুরু করে। ভজহরি অ্যাটর্নিবাবুর ভৃত্য হিসেবে কাজ করছিল। ঘটনাক্রমে স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়। তারা উভয়েই নিজ নিজ কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে আসে। তারা নিজেদের কুটির সংস্কার করে গাভী কিনে জাত ব্যবসা শুরু করে সুখের সংসার করতে লাগলো। দাম্পত্য কলহ দিয়ে গল্পের সূচনা হলেও গল্পের পরিণতি মিলনান্তক।

দুধ মা:

আলোচ্য 'দুধ মা' গল্পে উচ্চবর্গের অন্তঃসারশূন্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, কপটতা ও নিম্নবর্গের কর্তব্য নিষ্ঠা ও সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের সূচনা হয়েছে সার্কুলার রোডের উপর বড় বাগানওয়ালা নীলবর্ণের দ্বিতলবাড়ি ও গৃহকর্তার পরিচয় দিয়ে। গৃহকর্তা ডি. ভাদুড়ী মিন্টো মেডিক্যাল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক এবং এই কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের বড়কর্তা। ডাক্তার ভাদুড়ী ও তার স্ত্রী বিভাবতী এই গৃহে বসবাস করেন। অর্থ, যশ,খ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির অভাব না থাকলে সন্তানের অভাবে নিঃসন্তান এই দম্পতির মানসিক প্রশান্তি নেই। ডাক্তারবাবুর বাড়ির সদর বারান্দায় এক অজ্ঞাত পরিচয় সদ্যোজাত পুত্র সন্তান পাওয়া নিয়েই গল্পের কাহিনি পরিণতির দিকে এগিয়েছে। সকালে ডাক্তারবাবুকে ঘুম থেকে তুলে বাড়ির ঝি সোনার মা বলল-

" কোন অবাগী শতেকখোয়ারী এমন কাজ করলে মা, তা তো জানিনে! একটা মরা ছেলে এনে, আমাদের সদর বারান্দায় শুইয়ে রেখে গেছে।" ১০

ডাক্তার গৃহিণীর মতে-

"... এ নিশ্চয়ই কোনও নষ্ট স্ত্রী লোকের কাজ । বিধবা টিধবা কেউ প্রসব হয়েছে, তার আত্মীয় বন্ধুরা গলা টিপে মেরে এইখানে ফেলে রেখে গেছে।" ১১

গৃহিনীর এই কথা শুনে সোনার মা, যে কথা বলেছে তাতে নিম্নবর্গের ভাষার সার্থক নিদর্শন মিলে সে বলেছে-

" তাই হবেক গো, তাই হবেক। পুলিশে খবর দাও মা, তারা ধরে নিয়ে গিয়ে হারামজাদি নচ্ছার মাগীকে ফাঁসি দিক।"১২

ডাক্তার বাবু শিশুকে দেখে বললেন যে, শিশুটি মৃত নয় জীবিত। গৃহিণী শিশুকে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিষয়টি পুলিশকে জানিয়ে নিঃসন্তান ডাক্তার দম্পতি শিশুকে নিজেদের কাছে রেখে দিলেন। এই দম্পতি শিশুকে খোকা বলে ডাকেন।

ডাক্তাবাবু হাসপাতালেই খোকার দুধ মার সন্ধান পান। তার নাম ফুলটুসিয়া,জাতিতে দোষাধ, বাড়ি পাটনা। বাবা মারা যাওয়ার পর শিয়ালদহের কাছে মামার বাড়িতে তারা বসবাস করে। ফুলটুসিয়া খোকাকে দুধ পান করায়। সে খোকাকে আপন সন্তানের মত স্নেহ করে। খোকাও তাকে ছাড়া থাকে না। ইতিমধ্যেই খোকা এক বছরের হয়েছে।

সে দুধ মাকে ‘ফুলি- মা’ বলে ডাকে। খোকার বয়স দুই বছর হলে ফুলি সন্তান সম্ভবা হয়। ডাক্তারবাবু এবার ফুলিকে বিদায় করলেন। ফুলির খোকাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। সে কান্নার সুরে বলল,

"খোকাকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকবো মা? কেমন করে আমার মুখে ভাত জল রুচবে ?" ১৩

ফুলির এই উক্তিতে তার মাতৃ হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। খোকাও রাতে ফুলি-মা যাবো বলে কান্না করে। আশ্বিন মাসে ফুলির পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এদিকে ফাল্গুন মাসে খোকা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। এই খবর শোনামাত্র ফুলি সব বাধা উপেক্ষা করে খোকার কাছে ছুটে আসে। কিন্তু যথাযথ চিকিৎসার পরেও খোকা বাঁচলো না। খোকার মৃত্যুতে ডাক্তার গৃহে শোকের ছায়া। এদিকে ফুলি বিলাপ করে বলে-

"ওরে আমার ধন রে, আমার বুকের কলজে রে, আমায় ছেড়ে তুই কোথায় চলে গেলি রে?" ১৪

খোকার মৃত্যুর পর তার শেষকৃত্য খ্রিস্টীয় ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী করার জন্য পাদ্রীসাহেব ডাক্তারবাবুর কাছে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতে ডাক্তার ভাদুড়ী আপত্তি করেন। তিনি বলেন যে, আমি তার জনক না হলেও পিতা। তখন পাদ্রী সাহেব জানান যে, আমি তার পিতামহ। পাদ্রী সাহেব খোকার জন্মরহস্য উন্মোচন করে জানান যে, তাঁর পুত্র জোসেফের ঔরসে ফুলির গর্ভে খোকার জন্ম। খোকার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হওয়ার পর গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

বন্য শিশু:

প্রভাতকুমারের ‘বন্য শিশু’ গল্পটি তাঁর 'ষোড়শী' গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৭ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যায়। গল্পের প্রধান চরিত্র কুমুদনাথ ডাক্তারের পরামর্শ মেনে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য শীতঋতু যাপন করতে স্ত্রী গিরিবালা ও দুই বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে সিমলা যাত্রা করেন। সিমলা কালেক্টারি অফিসে কুমুদবাবুর সতীর্থ যদু বাবু ছিলেন। সেখানে থাকার ভালো বন্দোবস্ত হয়। একদিন কুমুদবাবু তারাদেবী মন্দিরে পুজো গিয়ে মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে গল্প করার সময় এক পাহাড়ী শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। পুরোহিত জানান যে, দুদিন আগে সেই ছেলেটিকে কুড়িয়ে পেয়েছেন। কুমুদবাবু ছেলেটিকে মানুষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি স্ত্রীকে বলেন-

"দেখ এরা অসভ্যজাতি, এদের কি ছেলে হারালে কোন দুঃখ আছে? তাহলে মা আসত, নিয়ে যেত। এখানে থাকলে ছেলেটি দু'দিনে মারা পড়বে।" ১৫

শিশুটিকে বাড়ি আনা হলো, তার নাম রাখা হয় বুনো। খোকার সঙ্গে বুনোর বেশ ভাব জমে উঠল। তার সঙ্গে সারাদিন খেলাধুলা করল। কিন্তু পরের দিন সে জ্বরে আক্রান্ত হল। তার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আনা হলো। কিন্তু দুদিন পর গিরিবালার কোলে বুনোর মৃত্যু হল। বুনোর অকাল প্রয়াণে ভীষণ কষ্ট পেল এই দম্পতি। বুনোর মৃত্যুর পর এক পাহাড়িয়া রমণী বাসায় ঢোকার চেষ্টা করলে ভৃত্য বিশুয়া তাকে ধরে ফেলে। একদিন খোকাকে নিয়ে বিশুয়া ঘুরতে যায় তখন এই পাহাড়িয়া রমণী খোকাকে আক্রমণ করে। পুলিশ এই রমণীকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। কুমুদবাবু পুলিশের কাছে জানতে চান তার ছেলেকে আক্রমণের কারণ কি, উত্তরে দারোগা বলল-

" ও বলে, তারাদেবী পাহাড়ে ওর ছেলে হারাইয়া গিয়েছিল, আপনি আনিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, তাই ও প্রতিশোধ লইতে চাহে।" ১৬

কুমুদবাবু অবাক হন। পরের দিন খোকা খেলাধুলা করে ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময় সেই রমণী বিদ্যুৎ বেগে ঘর থেকে তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। "সেই সর্বনাশী লেপচা- রমণী; কিছুক্ষণ পূর্বে রক্ষীকে হত্যা করিয়া গারদ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।" ১৭

এই লেপচা রমণী বিশুয়ার গলদেশ ছিন্ন করে ঘরে ঢুকে খোকাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছে। এইভাবে ট্র্যাজিক পরিনিতির মাধ্যমে গল্পের সমাপ্তি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সমাজবাস্তবতা অঙ্কনের নিপুণ কারিগর। তিনি জীবন জীবিকার তাগিদে ব্যক্তিগত জীবনে নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পেশাগত জীবনে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর ছোটগল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করছেন। " তাঁর ছোটগল্পগুলি চলতি জীবনের এক-এক টুকরো ভাসমান ছবি।" ১৮

তিনি জীবনে নিজের দেখা বাস্তব ঘটনাগুলো ছোটগল্পে বাস্তবসম্মত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই সমাজের চলমান চিত্র তাঁর গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সমাজের নিম্নবর্গের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনকথা অত্যন্ত দরদের সঙ্গে তিনি গল্পের মূল উপজীব্য করেছেন। তিনি তাঁর গল্পে অধ্যাপক, চিকিৎসক,হাকিম, উকিল,জেলার,পত্রিকা সম্পাদক সহ উচ্চবর্গের পেশার মানুষের পাশাপাশি মুটে, মজুর,ঠেলাওয়ালা,ঝি, চাকর,দারোয়ান, ডোম, মাতাল সহ অন্যান্য নিম্নবর্গের পেশার মানুষের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর গল্পে বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছে। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমনকি দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে বিদেশের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাঁর ছোটগল্প তৎকালীন সমাজের জীবন্ত দলিল। " বিশ শতকের প্রথম পাদে বঙ্গ-বিহার- উত্তর প্রদেশের ধনী-দরিদ্র মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের সামাজিক জীবনের বাস্তবচিত্ত তিনি অঙ্কন করেছেন।" ১৯

ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরেই তিনি বাস্তবসম্মত ভাবে চরিত্র নির্মাণ করেছেন। চরিত্র উপযোগী ভাষা ব্যবহারে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষের পেশার সঙ্গে ভাষার সার্থক প্রয়োগ করেছেন। তাই একবিংশ শতাব্দীতেও প্রভাতকুমার সমান জনপ্রিয়।

উল্লেখপঞ্জি:

১। দাশ শিশিরকুমার: বাংলা ছোটগল্প, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ- আগস্ট ২০১২, পৃষ্ঠা:১৫১।

২। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার: গল্প সমগ্র (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ- আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা:৩৮৪।

৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:৩৮৫।

৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:৩৮৯।

৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:৩৯০।

৬। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ: বাংলা গল্প বিচিত্রা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, সপ্তম মুদ্রণ- ভাদ্র,১৪২১, পৃষ্ঠা: ২৬।

৭। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার: গল্প সমগ্র (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ- আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা:৩৯২।

৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৯২।

৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৯৩।

১০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬০০।

১১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬০০।

১২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬০০।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬০৬।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬০৭।

১৫। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার: গল্প সমগ্র (১ ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ- আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা:২০৮।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:২১০।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:২১০।

১৮। চৌধুরী শ্রীভূদেব: বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা:লি:, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ-২০১৭-২০১৮, পৃষ্ঠা:১৫১।

১৯। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার: কালের পুত্তলিকা ,দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ- জুন ২০১৫, পৃষ্ঠা:১৩৮